গয়া।

এক হিসাবে গয়ার ন্যায় তীর্থ ভারতে বস্তুতঃ বিরল। একাধারে গয়া হিন্দু ও বৌদ্ধের পরম মোক্ষ স্থান: এইখানেই বোধি তরুর মূলে বুদ্ধদেব সর্ব্ব প্রথম 'বুদ্ধত্ব' লাভ করিয়াছিলেন বৌদ্ধদের নিকটে তীর্থ হিসাবে এই জন্য গয়ার ন্যায় স্থান আর নাই। শুধু ভারতের নানা প্রদেশ হইতে নয়, সুদূর সিংহল, চীন, জাপান, তিব্বৎ, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশ হইতেও এজন্য এই মোক্ষ স্থান দর্শন করিবার জন্য প্রতিনিয়ত অসংখ্য বৌদ্ধ যাত্রী যাওয়া আসা করে। 'বুধগয়ার' বুদ্ধমন্দির ও পিপুল বৃক্ষটী বৌদ্ধমাত্রেরই পরম পীঠস্থান।

হিন্দুর চক্ষেও গয়া তদ্রূপ বা ততোধিক পবিত্র। হিন্দুর সনাতন বিশ্বাস, এই স্থানে পিণ্ডদান ব্যতীত পিতৃপুরুষের উদ্ধার বা ঊর্দ্ধগতি হয় না। বংশের কাহাকেও না কাহাকেও এইজন্য পুরুষানুক্রমে এই তীর্থে একবার আসিতেই হয়। নিজ কার্য্যে উপেক্ষা করা চলে, কিন্তু পিতৃ কার্য্যে উপেক্ষা প্রদর্শনে মহাপাপ—হিন্দুর ইহা জন্মগত সংস্কার। প্রতি বৎসর এজন্য ভারতের দিগ্দিগন্ত হইতে বহু যাত্রীর এই তীর্থে সমাগম হয়।

যে-দিনে রেল ছিল না, ষ্টিমার ছিল না, বা ভাল রাস্তাঘাট বা অপরবিধ পাচ রকম সুবন্দোবস্ত ছিল না, সে-দিনেও হিন্দুদিগকে কর্ত্তব্যবোধে এ তীর্থে আসিতেই হইত। কিন্তু সে-সব বাধা বিঘ্ন আজ আর নাই। তাই, বৎসরের সূচনা হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাত্রীর অবাধ চলাচলেরও বিরাম নাই।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল পথের 'গ্রাণ্ড কর্ড' শাখায় কলিকাতা হইতে ২৯২ মাইল উত্তর পশ্চিমে গয়া অবস্থিত। গয়া 'বিহার ও উড়িষ্যা' প্রদেশস্থ তদ্নামীয় বিশেষ জেলার হেড্ কোয়ার্টার ও প্রধান নগর, ফল্গু নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। গয়ার জল বায়ু ও স্বাস্থ্য ভাল। ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী সাহেবগঞ্জ উপকণ্ঠ সুপরিচ্ছন্ন এবং এইখানে বিচারালয়াদি ও সাহেবদিগের বাস।

প্রায় সর্ব্বদিক হইতেই যাত্রীদিগের গয়ায় আসিবার সুবিধা ও সুযোগ রহিয়াছে। কলিকাতা হইতে 'বোম্বে মেল' 'দেরাদুন এক্সপ্রেস্' ও অপর কয়টি এক্সপ্রেস্ গাড়ী এই শাখা পথে গয়া হইয়া বোম্বাই অঞ্চল, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, পঞ্জাব ও রাজপুতানার প্রান্ত সীমা অবধি প্রত্যহ গমন করে এবং আবার ফিরিয়া এই পথে কলিকাতা যায়। এই ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথেরই অপর দুই শাখা পাটনা ও কিউল জংসন হইতে আসিয়া এই গয়াধামে মিলিত হইয়াছে। এই সব পথে ভারতের যে-কোন স্থান হইতে যাত্রীরা অনায়াসে গয়ায় যাতায়াত করিতে পারেন।

ন্যূনাধিক আট নয় ঘণ্টায় কলিকাতা হইতে, পাঁচ ঘণ্টায় বেণারস হইতে, ছয় ঘণ্টায় প্রয়াগ হইতে ও তিন ঘণ্টায় পাটনা হইতে আজকাল ট্রেণযোগে গয়ায় পৌঁছান যায় বৎসরে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয় বলিয়া, রেলকর্তৃপক্ষ ও গবর্ণমেণ্ট, যাত্রীদিগের সুবিধার নিমিত্ত, আজকাল অনেক প্রকার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এখানকার রেলওয়ে যাত্রীনিবাস ও ষ্টেসন ঘরটী উভয়ই দেখিবার বস্তু। মুসাফিরখানা গৃহটী যাত্রীদের অবাধ কোলাহলে ও দোকানপসারীর বেচা কেনার হাঙ্গামায় রাত দিন মুখরিত হইতেছে। যাত্রী-দিগের থাকিবার জন্য গয়ায় বিস্তর ভাল ভাল ধর্ম্মশালা ও আশ্রমাদির বন্দোবস্ত আছে। সম্প্রতি ইঃ আইঃ রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ এখানে একটী আরামপ্রদ রেলওয়ে হোটেলও খুলিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, পাণ্ডাদের নিকট থাকিবার বাসস্থান ও অপর বিধ অনেকানেক সুবিধা যাত্রীগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

গয়ার হিন্দু পাণ্ডাগণের বিশেষ নাম—'গয়ালী'। গয়ালীরা প্রায় সকলেই প্রচুর ধনৈশ্বর্য্যশালী। যুগে যুগে যাত্রীদিগের নিকট হইতে অপরিমিত অর্থ সংগ্রহ করিয়া আজ ইঁহারা সমগ্র ভারত মধ্যে শ্রেষ্ঠ এক ধনী সম্প্রদায় বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু তাঁহাদের সে জোর জুলুমের দিন আর নাই। যাত্রীরাও সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছেন, আর গবর্ণমেণ্টেরও খর দৃষ্টি পড়িয়াছে, নিজ খুসীতে যাত্রীরা যাহা দেন সেই দক্ষিণা লইয়াই গয়ালী ঠাকুরদিগকে আজ কাল সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। তবে ধর্ম্মের দোহাই ও নানা প্রকার শ্লোক বাক্যদ্বারা

ফল্গুনদী ও গয়ার দৃশ্য

সুবিধামত নিজ প্রাপ্যগণ্ডার বহর বর্দ্ধিত করিতে চেষ্টার তাঁহারা কসুর করেন না, আর তীর্থ কার্য্যের পরিমাণানুযায়ী একটা নির্দ্দিষ্ট খরচের হারও ইতি মধ্যে প্রায় সুপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

তীর্থগৌরব ভিন্ন গয়ার অন্যবিধ সম্পদ ও প্রতিষ্ঠা আরও আছে যাহার জন্য ইহাকে সমগ্র ভারতে অন্যতম একটা প্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্য ও সুপরিচিত স্থান বলা চলে। কি প্রাকৃতিক দৃশ্য, কি প্রাচীন কীর্ত্তিমালার সমাবেশ—উভয়তঃই গয়া সমুজ্জল। মূল সহরটীর ভিতরের অবস্থা তেমন সুপরিষ্কৃত বা প্রীতিপ্রদ না হইলেও সহরের চতুর্দ্দিকের শোভা কিন্তু নয়ন রঞ্জন। ট্রেণ হইতে ফল্গু তটের শোভা দেখিলে বস্তুতঃ মুগ্ধ হইতে হয়। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পর্ব্বত শ্রেণীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া দর্শকের হৃদয়ে আনন্দ ধারা সঞ্চারিত হয়। এতদ্ব্যতীত এই স্থানে এবং ইহার নিকটবর্ত্তী ভূমে অনেক সুপ্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের শেষ চিহ্ন অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনত্বের হিসাবে তাহাদের তুলনা সচরাচর দৃষ্টি-গোচর হয় না।

এই স্থানের অক্ষয় বট প্রয়াগ তীর্থের অক্ষয় বটের মতই পবিত্র এবং কোন এক রহস্যাবৃত অতীত সুপ্রাচীন যুগের পরম সাক্ষী। বুদ্ধ গয়ার বৌদ্ধ মন্দিরটী, কি প্রাচীনত্বে, কি শিল্পনৈপুণ্যে সমগ্র জগতের প্রকাণ্ড একটা বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সামগ্রী হইয়া আজও নূন্যাধিক দু হাজার বৎসরের স্মৃতি বহন করিতেছে। কথিত হয়, নিকটবর্ত্তী 'বোধিদ্রুম' নামক পিপ্পল বৃক্ষটীর নিম্নেই ভগবান গৌতম একদিন বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া ব্যাধি জরা ও মৃত্যুর প্রপীড়িত জগতের সম্মুখে নূতন এক সিদ্ধির আলোক ও মুক্তির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত, গয়ার নিকটবর্ত্তী 'বরাবর' পাহাড় শ্রেণী ও মগধের প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহের ভগ্নাবশেষ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মাত্রেরই আদরের ও শ্রদ্ধার সামগ্রী। এইখানেই কোনো দিন নাকি প্রবল পরাক্রান্ত মগধরাজ জরাসন্ধের রাজধানী ছিল, এবং সেইকাল হইতেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ নন্দবংশ পর্য্যন্ত মগধেরা এই স্থানেই নাকি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপিও এই সকল নানা অজ্ঞাত ও অর্দ্ধজ্ঞাত সুপ্রাচীন যুগের কীর্ত্তিকলাপের ভগ্নাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও গয়ার মাহাত্ম্য সামান্য বা তুচ্ছ করিবার মত নহে। অপর অনেক সুপ্রাচীন তীর্থস্থানের মত গয়ার আদি ইতিহাসও সুদূর অতীতের ঘন তমসায় আবৃত। প্রস্তরে খোদিতলিপি

বুদ্ধ গয়ার মন্দির।

ইত্যাদি হইতে ইহার কিছু আভাষ পাওয়া যায়। ক্যানিংহাম ও হণ্টর প্রমুখ বৈদেশিক পণ্ডিতগণ বলেন, আদিতে গয়া বৌদ্ধ তীর্থরূপেই প্রকট হইয়াছিল, পরে বৌদ্ধযুগের অবসানে হিন্দুর অধিকারে আসে এবং ক্রমে হিন্দু তীর্থে

পরিণত হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রেরও এই মত। কিন্তু যুক্তি তর্কদ্বারা এমতের পোষকতা হয় না। বুদ্ধদেবের জন্মের বহু পূর্ব্বে লিখিত অনেক গ্রন্থেই গয়া তীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। নানা পুরাণাদির সাক্ষ্য ছাড়িয়া দিলেও, মহাভারতে, রামায়ণে, এমন কি স্মৃতিশাস্ত্রেও এই তীর্থের উল্লেখ আছে।

প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠে জানা যায়, পুরাকালে শ্বেত কল্পে এই স্থানে 'গয়' নামক বিশাল দেহ এক পরম বিষ্ণুভক্ত অসুরের তপস্যা ভূমি ছিল। তাঁহার তপস্যার কঠোরতা ও একনিষ্ঠ সাধনা দেখিয়া দেবতাদের বড় ভয় লাগিয়া যায়, না জানি অসুর কাহার কি অধিকার তপস্যা প্রভাবে কাড়িয়া লইবেন। সমস্ত দেবতারা ব্রহ্মাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া অগত্যা ভগবান বিষ্ণুর শরণাগত হইলেন। বিষ্ণুর পরামর্শে ব্রহ্মা যাইয়া অসুরকে প্রশ্ন করিলেন—"গয়, এমত কঠোর তপস্যা করিতেছ, ইহার অর্থ কি? কি তোমার প্রার্থনা?" গয় কহিলেন "প্রভো, আমি অর্থ চাই না, স্বর্গ চাই না, কাহারও অধিকারও কাড়িয়া লইতে চাই না কিন্তু আপনাদের প্রসাদে আমার এই দেহখানি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ও পবিত্র হউক—এই প্রার্থনা করি।" ব্রহ্মা কহিলেন—'তথাস্তু' কিন্তু না বুঝিয়া বড় ঠকিয়া গেলেন। অতঃপর যে কেহ গয়াসুরের পবিত্র মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া দেখে চতুর্ভুজ হইয়া নিষ্পাপ দেহে বৈকুণ্ঠে চলিয়া যায়, দেবতারা ধরিতে ছুঁইতে পান না। যমের অধিকার তো লোপ পাইতে বসিল। দেবগণ যাইয়া বিষ্ণুর দ্বারে আবার উপস্থিত। পরামর্শের মত একটা পরামর্শ পাইয়া এইবার তাঁহারা গয়কে যাইয়া পুনঃ কহিলেন—"গয়, আমাদের একটা ভিক্ষা আছে। একটা ভারী যজ্ঞ করিব কিন্তু তেমন পবিত্র স্থান খুঁজিয়া পাই না। শুনিতে পাই সমগ্র জগতের ভিতর কেবল তোমার দেহখানিই একমাত্র নিষ্পাপ।" গয় ভিতরের কথাটা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন—"আচ্ছা, আপনাদের বাসনা পূরণ করিব, কিন্তু একটা বর প্রার্থনা করি। এ যজ্ঞ বেদীর উপর অতঃপর যে-কেহ পিতৃ পুরুষের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি বা পিণ্ডদানাদি করিবেন, তাঁহার সকল পুরুষ আপনাদের কৃপায় মুক্তি প্রাপ্ত হউক, আর পাপ ও নরক যন্ত্রণা তাহাদের নিকট হইতে দূর হউক।"

কি আর করা যায়। দেবতারা ভাবিলেন, সর্ব্বস্ব যাইতে বসিয়াছে, এ অবস্থায়—'সাদ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ', রাজী হইলেন। অসুরের মস্তকোপরি তখন প্রকাণ্ড একখানা পাথর টানিয়া আনিয়া বহু কষ্টে চাপা দেওয়া হইল, আর তদুপরি, অসুরকে অথর্ব্ব ও নিশ্চল করিবার অভিপ্রায়ে, মহা হর্ষে দেবতারা চাপিয়া বসিলেন। কিন্তু দুর্জ্জয় অসুর, এত ভারেও স্থির হয় না, নড়িতে লাগিল। শেষটা গদাধর মূর্ত্তিতে স্বয়ং বিষ্ণু আসিয়া পাথর খানিতে গদাঘাত ও পদক্ষেপ করিতে তবে স্থির হইল। স্থির হইল বটে, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে তাহার বিরাট দেহ দেশদেশান্তর জুড়িয়া একটা বিরাট পর্ব্বতের মত পড়িয়া গেল এবং তাহার নাভিদেশ হইতে উড়িষ্যার যাজপুরে সুদূর বৈতরণী তীরে 'নাভিগয়া' তীর্থের সৃষ্টি হইল, আর এইখানে ফল্গুতীরে তাহার সেই প্রকাণ্ড মস্তকটী ও শিরোভূষণ যজ্ঞ শিলা খানি হইতে, তাহারই স্মৃতি বহন করিতে গয়া ধামের উদ্ভব হইল। ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী বিষ্ণুও সঙ্গে সঙ্গে, গদাধর মূর্ত্তিতে ও এই পদাঙ্করূপে এইখানে বাঁধা পড়িয়া গেলেন।

এই সব বায়ুপুরাণান্তর্গত 'গয়ামাহাত্ম্যের' উক্তি। মহাভারতে দেখিতে পাই, গয় নামে অপর একটী রাজর্ষি অপর এক যুগে, অতি রাজসিক ও বিরাট ভাবে, এইখানে অপর একটী যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং সেই যজ্ঞের পুণ্যফল হইতে গয়া এতাদৃশ পবিত্র পুণ্য ক্ষেত্র হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, রামায়ণ হরিবংশ, অগ্নিপুরাণ ও মার্কণ্ডেয়পুরাণ ইত্যাদিতেও গয়া তীর্থের উল্লেখ অল্পাধিক দৃষ্ট হয়।

বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে, বুদ্ধদেব যখন উরুবিল্ব (বর্ত্তমান বুদ্ধগয়া) গ্রামে প্রথম উপস্থিত হন, সে সময়ে এই স্থানটী পরম তপস্বী বহু যোগী ঋষির আবাস ভূমি ছিল এবং ফল্গুর জল তখনও পরম পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। তারপর, বুদ্ধদেবের 'বুদ্ধত্ব' লাভের পর হইতে এই স্থানটী বৌদ্ধদিগেরও অন্যতম মোক্ষধাম বলিয়া পরিচয় লাভ করে।

গয়া অঞ্চলটী পূর্ব্ব হইতেই মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু রাজ-চক্রবর্ত্তী অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পর হইতেই রাজানুগ্রহে ইহার সৌন্দর্য্য

অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং নানারূপ বিহার, স্তূপ ও সঙ্ঘারামের সমাবেশে কলেবর সুসজ্জিত হয়। বুদ্ধগয়া, ব্রহ্মযোনি পাহাড় ও বরাবর পাহাড় ইত্যাদি অঞ্চলে এই অশোক নৃপতির বিশাল কীর্ত্তিকলাপের ভগ্নাবশেষ আজ পর্য্যন্তও বর্ত্তমান আছে এবং উহাদের পূর্ব্বগৌরবের কথা, ফা-হিয়ান ও হিউএন্‌সাং নামক বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজকদ্বয়ের ভ্রমণ কাহিনী হইতে, আজ পর্য্যন্তও আমরা অবগত হইতে পারি।

এই দুই পরিব্রাজকের সাক্ষ্য হইতে আজ আমরা আরও অবগত হই যে, যদিও এই সময় হইতে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত এই তীর্থে বৌদ্ধ ধর্ম্মের একাধিপত্যই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তথাপি সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বাহ্ণ হইতে হিন্দু প্রাবল্য পুনঃ এই স্থানে ফিরিয়া আইসে এবং সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ প্রাধান্যও ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়।

তারপর, সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত হিন্দু ধর্ম্মের প্রাধান্য এই গয়াতে প্রায় সমভাবেই চলিয়া আসিয়াছে এবং হিন্দুরা ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধ তীর্থবেদী-গুলিকেও আপনাদের অন্যতম তীর্থবেদীরূপে পরিচিত করিয়া লইয়াছেন। ফলে, বুদ্ধগয়ার বৌদ্ধদের পরম শ্রদ্ধার তীর্থবেদীগুলি আজ হিন্দুদেরই করকবলিত; এই সব স্থানে বৌদ্ধদের সঙ্গে আজকাল অবাধে এবং সমান ভাবে হিন্দুরাও তীর্থ ধর্ম্ম করিতে পায়। বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার রূপ-গ্রহণ করিয়াই হিন্দুরা এই সুবিধাটুকু করিয়াছেন। বুদ্ধগয়ার বুদ্ধমূর্ত্তির নিকট প্রণতঃ হইয়া আজ হিন্দু যাত্রী মন্ত্র পাঠ করে—

"অশ্বত্থরূপিণং দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
নমামি পুণ্ডরীকাক্ষং বৃক্ষরাজধরং হরিম্॥"

বৃক্ষরূপধারী অশ্বত্থরূপী দেবতা শঙ্খচক্রগদাধর পুণ্ডরীকাক্ষ হরিকে প্রণাম করি।

আর বৌদ্ধদিগের 'বোধিতরু' নামক পিপ্পল বৃক্ষ নিম্নে নমস্কার করিতে করিতে বলে—

বুদ্ধদেব

" চঞ্চলায় বৃক্ষায় সর্ব্বদা স্থিতি হেতবে।
বোধিসত্ত্বায় যজ্ঞায় অশ্বত্থায় নমোনমঃ।
একাদশোঽসি রুদ্রাণাং বসূনাং পাবকস্তথা।
নারায়ণোঽসি দেবনাং বৃক্ষরাজঽসি পিপ্পল॥
অশ্বত্থ যস্মাত্ত্বয়ি বৃক্ষরাজ নারায়ণস্তিষ্ঠতি সর্ব্বকালম্।
অতঃ শুভত্বং সততং তরূণাং ধন্যোঽসি দুঃস্বপ্নবিনাশনোঽসি॥"

চঞ্চল শাখাদল সমন্বিত ও সর্ব্বদা জগতের স্থিতিকারণ যজ্ঞবৃক্ষ বোধিসত্ত্ব অশ্বত্থকে

নমস্কার প্রণাম করি। রুদ্রগণের মধ্যে যেমন একাদশ রুদ্র, বসুগণের মধ্যে যেমন পাবক ও দেবতাদের মধ্যে যেমন নারায়ণ, তেমনই বৃক্ষগণের মধ্যে তুমি পিপ্পল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হে বৃক্ষরাজ অশ্বত্থ, যে হেতু নারায়ণ তোমাতে সর্ব্বকাল অবস্থান করেন সেই হেতু তুমি সর্ব্বদা শুভ এবং তরুগণের মধ্যে ধন্য এবং সর্ব্ববিধ দুঃস্বপ্ন বিনাশের কারণ।

ইহা ব্যতীত, হিন্দুগয়ার অন্যান্য তীর্থবেদীর মত এই বুদ্ধগয়ায়ও আজকাল পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি ও পিণ্ডদানাদি কৃত্যানুষ্ঠানের সুব্যবস্থা হইয়াছে।

কিন্তু ধর্ম্ম বিশেষের আধিপত্য যাহাই হউক, মনে হয়, সেই আদি মগধাধিকারের যুগ হইতে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই স্থানটী সমভাবে মগধ সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তদন্তে কনৌজের হিন্দু নৃপতিগণের শাসনাধিকারে আসে। তৎপর, মুসলমানগণ মগধ ও বাঙ্গালা জয় করিতে মুসলমানের করায়ত্ত হয়, এবং মোগলদিগের পতনের সূচনা কাল পর্য্যন্ত প্রায় ঐ অবস্থায়ই থাকে। তারপর কিছুকাল কখনও মারহাট্টাদের বশ্যতা, কখনও বা মুসলমানদের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া শেষটা অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে পাকাপাকি ভাবে ইংরাজদিগের হাতে আসে। বেহারের সেতাব রায়ের হাতে সে সময়ে ইহার সুবন্দোবস্তের ভার পড়ে।

গয়া তীর্থের অপরিমেয় মাহাত্মের কথা বর্ণনা করিতে যাইয়া অগ্নিপুরাণ ও বায়ুপুরাণের 'গয়া মাহাত্ম্য' অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে—পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান এ তীর্থের বিশেষ কৃত্য বলিয়া গয়াধামের নামান্তর—পিতৃ তীর্থ। মৃত ব্যক্তির কর্ম্মফল যাহাই কেন থাকুক না এই তীর্থে পিণ্ডদানের ফলে অচিরাৎ উদ্ধার ও স্বর্গ গতি হয়।

গয়া মাহাত্ম্য বলেন—

> "আত্মজন্যাত্মজো বাপি গয়া শ্রাদ্ধে যদাতদা।
> যন্নাম্না পাবয়েৎ পিণ্ডং তন্নয়েদ্ ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥"

নিজ পুত্র কিম্বা অপর কোনও ব্যক্তি কোনো সময়ে গয়ায় যাইয়া কাহারও

বিষ্ণু মন্দির—গয়া।

নামোল্লেখ পূর্ব্বক পিণ্ডদান করিলে সে ব্যক্তি শাশ্বত ব্রহ্মলোকে গমন করে। এবং—

"গয়ায়াং সর্ব্বকালেষু পিণ্ডঃ দত্তাদ্বিচক্ষণঃ।
আধিমাসে জন্মদিনে অস্তে চ গুরু শুক্রয়োঃ।
ন তত্রত্যং গয়া শ্রাদ্ধং সিংহস্থে চ বৃহস্পতৌ॥"

সর্ব্বকালেই পণ্ডিতগণ গয়ায় পিণ্ডদান করিবেন। মলমাস, জন্মদিন, অকাল বা বৃহস্পতি সিংহযুক্ত হইলেও গয়াশ্রাদ্ধ পরিত্যাগ করিবেন না। আরও—

"মুষ্টিমাত্র প্রমাণেন চাক্ষামলক মাত্রতঃ।
শমীপত্র প্রমাণেন পিণ্ড দত্তাদ্ধ্যশিরে॥
উদ্ধরেৎ সপ্তগোত্রান্ কুলমেকোত্তরং শতম্।
মাতা পিতাচ ভার্য্যাচ ভগিনী দুহিতৃঃ পতিঃ।
পিতৃষসা মাতৃষসা সপ্তগোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
বিংশতিবিংশতিঃ পিত্রোরষ্টেন্দ্রাঃ ষোড়শক্রমাৎ।
একাদশ দ্বাদশাথ কুলান্যেকোত্তরং শতম্॥"

মুষ্টিপ্রমাণে, একটী মাত্র আমলকী ফল বা শমীপত্রের আকারেও গয়াশীর্ষে পিণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য। এইখানে পিণ্ডদানের ফলে নিজকুল, মাতুলকুল, শ্বশুর-কুল, ভগিনীপতি, জামাতা ও মেসো পিসেরকুল এই সপ্ত গোত্রেরই উদ্ধার সাধন হয়। পিতা ও মাতামহের কুড়ি, শ্বশুরের আট, ভগিনীর চৌদ্দ, জামতার ষোল এবং পিসে ও মেসোর ক্রমে এগারো ও বারো সপ্ত গোত্রের এই ১০১ কুল ইহার ফলে উদ্ধার পায়।

এ সম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্য ও রামায়ণের দুইটী উক্তিও যথেষ্ট ইঙ্গিত ও অর্থপূর্ণ—

যদ্দদাতি গয়াস্থশ্চ সর্ব্বমনন্ত্যমশ্নুতে।" (যাজ্ঞবল্ক্য)

অর্থাৎ গয়াশ্রাদ্ধ কালে যাহা কিছু দেওয়া যায় সে সমস্তই অনন্ত ফলপ্রদ।

"এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা গুণোবন্তো বহুশ্রুতাঃ।
তেষাং বৈ সমবেতানামপি কশ্চিৎ গয়াং ব্রজেৎ॥"

(অযোধ্যা কাণ্ড—রামায়ণ)

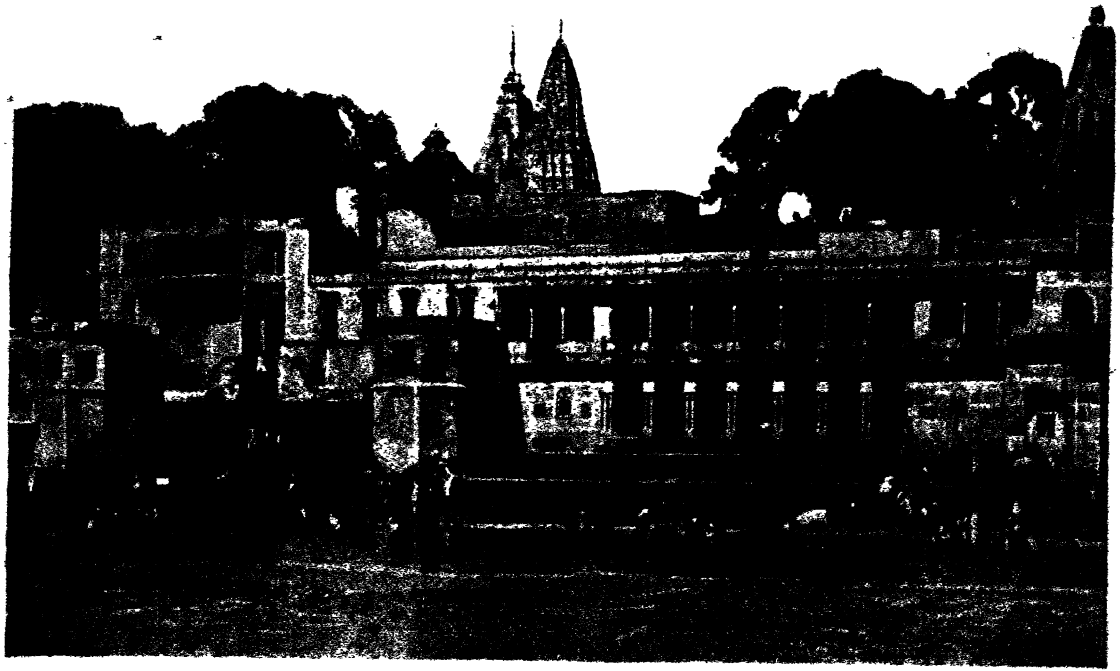

ফল্গুনদী ও বিষ্ণু মন্দির।

এজন্যই, পুত্রসকলের মধ্যে অন্ততঃ একজনও গয়ায় যাইবে, এই ভরসায় লোকে গুণবান ও জ্ঞানসম্পন্ন বহু পুত্র কামনা করে।

গয়া-কৃত্য।

বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান এবং ফল্গু তীরে শ্রাদ্ধ—এ দু'টাই এ তীর্থে মুখ্য কার্য্য। ইহাদের দ্বারাই পিতৃগণের সদ্গতি ও উদ্ধার সাধন হইতে পারে, কিন্তু সম্যক্ ভাবে গয়াফল লাভ করিতে হইলে আরও অনেক কিছু করিতে হয়। গয়াতে অন্যূন ৪৫টী তীর্থবেদী আছে পূর্ব্বে নাকি আরও ছিল। ইহাদের প্রায় সকল গুলিতেই পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধাদিই প্রধান কার্য্য, তবে মাঝে মাঝে স্নান, দান ও দর্শনাদি কৃত্যেরও ব্যবস্থা আছে।

সকল তীর্থে সকল কার্য্য সম্পাদন—খরচ ও সময় সাপেক্ষ। সকল কার্য্য সকলে করিয়া উঠিতে পারেন না। এজন্য কেহ ৪৫টী, কেহ ৩৮টী কেহ ৩টী, আর কেহ বা ২টী করিয়াই ক্ষান্ত হন, এই চারি শ্রেণীর কার্য্যই নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রথম শ্রেণীর পূর্ণাঙ্গ তীর্থ কর্ম্মকে 'খাপরাল' কহে। ইহাতে ২৫।৩০৲ টাকা হইতে অবস্থানুযায়ী দু'শ, পাঁচ শ, হাজার বা লক্ষ টাকাও খরচ করা যাইতে পারে। যাঁহারা সামান্য ভাবে কেবল প্রধান প্রধান কার্য্যগুলি নিষ্পন্ন করিয়া গয়াকৃত্য শেষ করিতে চান তাঁহারা ৫।৭৲ টাকায়ও কার্য্য শেষ করিতে পারেন। কিন্তু গয়ালীরা শেষ দক্ষিণা আদায়ের সময় বড় গোলযোগ করে, দাবী মত অর্থ না দিলে 'সুফল' বা কার্য্য সিদ্ধির সার্টিফিকেট দিতে চায় না। যাত্রীদের বিশ্বাস, এই 'সুফল' না হইলে গয়াকর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। পাণ্ডারা এই সুযোগে পূর্ব্বে অতি গুরুতর অত্যাচারই করিত। কিন্তু ইংরেজ সরকারের শাসনে এখন সে সব প্রায় দূর হইয়াছে। যাত্রীর অনিচ্ছায় এখন আর তাঁহারা জোর জুলুমে অধিক আদায় করিতে পারেন না, ধর্ম্মের ও পুণ্যের নামে বক্তৃতা করিয়া অবস্থানুযায়ী যাহা আদায় করিতে পারেন তাহা লইয়াই 'সুফল' দেন। তীর্থকার্য্য সকলই পাণ্ডাদিগের হাতে, সমস্ত দেখাইয়া শুনাইয়া গোছগাছ করিয়া যাত্রীদিগকে তীর্থ কার্য্য করান, এবং তাঁহাদের থাকিবার ও

দর্শনাদিরও ব্যবস্থা করেন। কিন্তু একটু বেশী আদায়ের কিকির সকল সময়েই আছে, এটা তাঁহাদের জাতিগত ধর্ম্ম। সুতরাং সাবধান থাকা আবশ্যক।

'ত্রিস্থলী সেতু' ও 'গয়াতীর্থযাত্রা পদ্ধতি'তে প্রায় সকল তীর্থ কর্ম্মের নিয়মাবলী ও বিধান সমূহের সবিস্তার উল্লেখ আছে। কিন্তু তেমন ভাবে তীর্থ কর্ম্ম করা আজকাল আর কাহারও ধাতে সয় না।

আজকাল সাধারণতঃ—ফল্গু তীর্থে স্নান তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি এবং বিষ্ণু-পাদপদ্মে পিণ্ডদান, ও গদাধর, অক্ষয় বট ও রামশিলা, প্রেতশিলা, ব্রহ্মযোনি পাহাড়, 'বুধ'গয়া প্রভৃতি কয়েকটী প্রধান প্রধান স্থান সন্দর্শন—ইহাদের মধ্যেই যাত্রীগণের তীর্থ কর্ম্ম আবদ্ধ। দুই তিন দিনের মধ্যেই এই সকল কার্য্য অনায়াসে সুসম্পন্ন হইতে পারে। যাঁহারা নিতান্তই সকল তীর্থ কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে করিবেন, তাঁহারা 'ত্রিস্থলী সেতু' ও 'গয়া যাত্রা পদ্ধতি'র নির্দ্দেশ মত দিন ভাগ ক্রমে কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারেন। উহাতে ৫।৭ দিন সময়ের আবশ্যক। এই দুই শ্রেণীর তীর্থ যাত্রীদের মধ্যে প্রথমোক্ত শ্রেণী ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের সপ্তাহান্তিক (week end) রিটর্ণ টিকিট ও শেষোক্ত শ্রেণী উক্ত রেলপথের সাধারণ (ordinary) রিটর্ণ টিকিট ক্রয় করিলে পথ-খরচের যথেষ্ট লাঘব হইবে।

উক্ত দুই গ্রন্থে গয়াকার্য্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ দিন বিভাগ করা আছে—

প্রথম দিন—ফল্গু তীর্থে ও ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ও তর্পণ. প্রেতলোকে ও প্রেতশিলায় শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানাদি, রাম তীর্থে পিণ্ডদান দেবতর্পণ ও পিতৃতর্পণ, যমবলি ও কুকুরবলি, উত্তর ও দক্ষিণ মানসে স্নান, তর্পণ, পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধাদি।

দ্বিতীয় দিন—ফল্গুতীর্থে ও ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান, শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান, গদাধর দর্শন ও তাঁহার পূজা ও প্রণাম, ধর্ম্মারণ্যে গমন ও 'বোধিতরু' ও বুদ্ধমূর্ত্তি দর্শন।

তৃতীয় দিন—ব্রহ্ম সরোবরে স্নান, গোপ্রচার বা ধেনুক তীর্থে আম্র বৃক্ষ দর্শন, যমবলি, কুকুরবলি, কাকবলি ও অবগাহন।

চতুর্থ দিন—ফল্গু-স্নানান্তে বিষ্ণু-পাদপদ্ম দর্শন, তথায় ও নিকটবর্ত্তী অপরাপর পদে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানাদি গয়েশ্বরী ও গদাধর দর্শন।

পঞ্চম দিন—গদালোল ও অক্ষয়বট তীর্থে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানাদি।

এতদ্ব্যতীত সুবিধামত নিম্নলিখিত ঠাকুর দেবতা ও মন্দিরাদিও দর্শন করিতে হয়, এবং আবশ্যকমতে স্থান বিশেষে পিণ্ডদান এবং শ্রাদ্ধাদিও আবশ্যক।

রামশিলা পাহাড়ের মহাদেব ও পার্ব্বতী মন্দির, রুক্মিণী কুণ্ড; মুণ্ডপৃষ্ঠ পাহাড়ের অষ্টভূজা দেবী; ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের 'ভীম গয়া', পঞ্চাননা আদ্যা-শক্তি এবং অপরাপর দেবমূর্ত্তি; ধেনুক বা গোপ্রচার তীর্থের গোবৎস পদ চিহ্ন এবং বুদ্ধগয়ার ব্রহ্মকূপ, বুদ্ধ-পদ-চিহ্ন ও 'মহাবোধি' তরু ইত্যাদি।

সকল বেদী দর্শন এবং সমস্ত শ্রাদ্ধ পিণ্ডদানাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হইলে পরিশেষে গায়ত্রী ঘাটে আসিয়া মূল গয়ালী পাণ্ডার নিকট 'সুফল' গ্রহণ করিতে হয় এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গেই গয়াকার্য্য সমাপ্তি। গয়াকৃত্য সম্পর্কীয় অপর একটী জ্ঞাতব্য কথারও এই স্থানে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। প্রায় সর্ব্বাবস্থায় এবং সর্ব্বকালে গয়াকার্য্য বিধেয় ও প্রতিপাল্য হইলেও আশ্বিন মাসে শারদীয় পূজার পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষ্ণ পক্ষটীতেই এই তীর্থে পিণ্ডদানের ঘটা বিশেষ রূপ দৃষ্ট হয়। এই জন্য এইখানে বৎসর বৎসর এই কালে সুবৃহৎ মেলা বসে এবং সে সময় অগণিত যাত্রিক সমাগমে গয়া লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। আশ্বিন মাসের এই পক্ষটী প্রেতলোকগত পিতৃপুরুষ মাত্রেরই প্রিয় কাল এবং এই কালে পিণ্ডদানে তাঁহাদের অশেষ তৃপ্তি ও সবিশেষ আনন্দ—হিন্দুর এই সুপ্রচলিত বিশ্বাস বশতঃ এই পক্ষটী 'পিতৃপক্ষ' বা 'প্রেতপক্ষ' এবং এই মেলাটী 'পিতৃপক্ষের মেলা' এই নামে সুপরিচিত হইয়াছে। ভারতের নানা দিক হইতেই দলে দলে বহুতর যাত্রিক, এই বিশ্বাস বশতঃ এই সময়ে গয়া তীর্থে সমবেত হন এবং পিতৃপুরুষের মঙ্গল কামনায় পূতসলিলা ফল্গু নদীতে ও বিষ্ণু-পাদপদ্মে পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধাদি করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করেন।

এই অতিরিক্ত ভীড় হেতু ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে এই সময়ে যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার নিমিত্ত যথাসম্ভব সুবন্দোবস্ত করিয়া থাকেন।

পিতৃপক্ষ মেলা

গয়ায় দ্রষ্টব্য।

গয়া তীর্থে নিম্নলিখিত স্থানগুলি প্রধানতঃ দ্রষ্টব্য :—

বিষ্ণুপদ মন্দির—এইটীই গয়ার সর্ব্ব প্রধান তীর্থবেদী। এইখানে বিষ্ণু পাদপদ্মে পিণ্ডদান এই তীর্থের সর্ব্ব প্রধান কার্য্য। যে শিলাখণ্ডখানিকে গয়াশিরে রাখিয়া দেবগণ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং যাহার উপর পদপীড়ন করিয়া বিষ্ণু অসুর নির্য্যাতন করেন এখনও এইখানে সেই শিলাখানি বিষ্ণুপদ চিহ্ন বুকে ধরিয়া পড়িয়া আছে এবং ইহারই উপরে যাত্রিকদিগের পিণ্ড অর্পিত হয়। কথিত আছে, গয়াসুর মস্তকদ্বারা এখনও এই শিলাখানিকে আশ্রয় দিয়া রহিয়াছেন কিন্তু এক দিন পিণ্ডাভাব হইলেই পাথর ঠেলিয়া উঠিয়া সৃষ্টি রসাতলে ডুবাইবে। হিন্দুর চক্ষে এস্থানের তুলনা নাই। মহাপ্রভু চৈতন্য এইখানে আসিয়াই এই পদচিহ্ন দর্শনে এমত আকুল হইয়াছিলেন, যে এক দিনে বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন। মন্দিরটীর কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্যও ভারত বিখ্যাত প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইন্দোরেশ্বরী অহল্যাবাঈএর বদন্যতায় নির্ম্মিত হয়। ২৫ বর্গহস্ত পরিমিত মন্দিরে মেজেতে দু'হস্ত প্রমাণ স্থান জুড়িয়া বিষ্ণুপদ বিরাজিত। পিণ্ডের পর পিণ্ড পড়িতেছে, আর গো-বৎস উদরস্থ করিতেছে। মন্দিরের বাহিরে বৃহৎ প্রাঙ্গন, প্রাঙ্গন মধ্যে নাটমন্দির। এটী রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের কীর্ত্তি, এটীও একটী দর্শনীয় বস্তু। বিষ্ণুপদ মন্দিরের সন্নিকটেই গদাধর ও গয়েশ্বরীর মন্দির এবং সূর্য্য মন্দির ও তদসম্মুখস্থ বৃহৎ পুষ্করিণী।

ফল্গু নদী—গয়া সহরের পূর্ব্ব পার্শ্বে অবস্থিত কিন্তু অন্তঃসলিলা। নদী বক্ষে বালি মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়, বালি না খুঁড়িলে জল পাওয়া যায় না। প্রবাদ এই যে আদি গদাধর হরীভূত হইয়া ফল্গু

হইয়াছেন, সুতরাং বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা হইতেও ইনি মহিয়সী এবং ইহাতে অবগাহনে একবারেই সকল তীর্থের ফল লাভ হয়। 'গয়া মাহাত্ম্যে' আছে—

"ফল্গুতীর্থে বিষ্ণুজলে করোমি স্নানমাদৃতঃ।
পিতৃণাং বিষ্ণুলোকায় মুক্তি ভুক্তি প্রসিদ্ধয়ে॥"

পিতৃগণের বিষ্ণুলোক কামনায় এবং মুক্তি ও ভুক্তির নিমিত্ত এই ফল্গুতীর্থে বিষ্ণুজলে শ্রদ্ধাসহকারে স্নান করি।
ফল্গুতীরে গয়া সহরের দৃশ্য অতি চমৎকার।

অক্ষয় বট—বিষ্ণুপদ মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিমে ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতমূলে স্থিত। এইখানে পিতৃলোকের উদ্দেশে যে-কিছু দানে মহাপুণ্য। মহাভারত বলেন, রাজর্ষি গয়ের যজ্ঞ কালে যে একটী বটবৃক্ষ অমরত্ব লাভ করিয়াছিল, সেটী—এই।

গয়ার পর্ব্বতমালা—রামশিলা, প্রেতশিলা, প্রেতপর্ব্বত, ব্রহ্মযোনি, মুণ্ড-পৃষ্ঠ ইত্যাদি—

ইহাদের সকল গুলিই দর্শনীয়। গয়াকে চারিদিক হইতে ইহারা একটী দুর্গ-প্রাকারের মত ঘেরিয়া রাখিয়াছে। প্রত্যেকটীরই তীর্থ সম্পদ আছে, এজন্য যাত্রিকেরা প্রায় এই সব স্থান দর্শন না করিয়া ফেরেন না। গয়ার মাইল পাঁচেক উত্তরে প্রেতশিলা, ৫৪১ ফিট উচ্চ, শীর্ষদেশে অহল্যাবাঈ নির্ম্মিত ক্ষুদ্র মন্দির, নিম্নে প্রভাস পর্ব্বত ও মহানদীর সঙ্গমে রামতীর্থ। প্রেতশিলার মৃত প্রেতাত্মার উদ্দেশে শ্রাদ্ধকর্ম্ম ও পিণ্ডদান কর্ত্তব্য। গয়ার ক্রোশ দুই বায়ুকোণে প্রেত পর্ব্বত—এইখানেও শ্রাদ্ধ কার্য্য বিহিত। সহরের প্রায় উত্তর সীমায় রামশিলা পাহাড়, ৩৭২ ফিট উচ্চ, ওখানে পাতালেশ্বরের ও পার্ব্বতীর মন্দির ও নাটমন্দির আছে। একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার

এই যে, পাতালেশ্বর মহাদেবের নাসিকামূলে হস্ত প্রসারণ করিলে নিঃশ্বাস পতনের ন্যায় মৃদু বায়ু সঞ্চরণ অনুভূত হয়। প্রায় ৩০০ ফিট দূরে মন্দিরের নিম্নভাগে একটী গভীর ও তমসাপূর্ণ নিবিড় গহ্বর। এইটির সঙ্গে মন্দিরস্থিত পাতালেশ্বরের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই দেবতাটির পাতালেশ্বর নাম হইয়া থাকিবে এবং হয়ত ইহারই আবদ্ধ বায়ু-প্রবাহ দেবতার নিঃশ্বাসের আকারে এই পথে নির্গত হয়। পর্ব্বতারোহণের নিমিত্ত পরপর সোপান শ্রেণী আছে। পর্ব্বতমূলে—রামকুণ্ড তীর্থ। গয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মযোনি পাহাড়। নানা কারণে এইটীর প্রতিষ্ঠা অসাধারণ। ইহার ঢালু গাত্রে 'অক্ষয় বট' নামক পবিত্র তরু, শীর্ষদেশে পঞ্চাননা আদ্যাশক্তির মন্দির এবং আরও অসংখ্য দেবতার ভগ্ন বিগ্রহ. পাদমূলে প্রেতুক তীর্থ, পৃষ্ঠে 'ভীম গয়া'। শীর্ষদেশের উচ্চতা ন্যূনাধিক ৪৫০ ফিট, মহারাষ্ট্রীয় দেবরাও ভাও সোপান শ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়া আরোহণ সুগম করিয়া দিয়াছেন। বৌদ্ধ সাহিত্যেও ইহার খ্যাতি আছে। অশোক নৃপতি এইখানে শত ফিট উচ্চ একটী স্তূপ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কীর্ত্তি আজ লোপ পাইয়াছে। এই স্থানের অসংখ্য মূর্ত্তি ও বিগ্রহ ঔরংজেব কর্ত্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। শিখরস্থিত আদ্যাশক্তির বিগ্রহটিও সেই কালে অঙ্গহীন হইয়াছিল। ব্রহ্মযোনির অদূরেই বিষ্ণুপদ মন্দির, রুক্মিণী তীর্থ পরপিতা মহেশ্বর ভূতেশ্বর, ইত্যাদি। ফল্গুতীরে অনুচ্চ মুণ্ডপৃষ্ঠ পাহাড় উপরে অষ্টভুজার মন্দির, চতুর্দ্দিকে আড়াই ক্রোশ লইয়া পঞ্চক্রোশী গয়া, নিকটে স্তম্ভ শ্রেণী বেষ্টিত 'আদি গয়া' তীর্থ। এইখানেই নাকি পূর্ব্বকালে পিণ্ডদানের প্রথা প্রচলিত ছিল।

বুদ্ধগয়া—এই বুদ্ধগয়াই বৌদ্ধ সাহিত্যের উরুবিল্ব গ্রাম যেখানে কঠোর তপস্যান্তে 'মার'কে পরাভূত করিয়া অবশেষে 'সিদ্ধার্থ

ব্রহ্মযোনি শিলা ও মন্দির।

অভিপ্সিত জ্ঞান বা 'বুদ্ধত্ব' লাভ করেন। সহর হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে ফল্গুর বাম তীরে অবস্থিত ফল্গুর নাম এইখানে 'নৈরঞ্জনা'। এইখানের 'বুদ্ধদেব মন্দির' জগদ্বিখ্যাত, প্রায় ১৯০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত, উচ্চতা ১০০ ফিট, মধ্যে বুদ্ধমূর্ত্তি। কারুকার্য্য ও প্রাচীনত্বের হিসাবে, ভারতে এই মন্দিরের তুলনা নাই বলিলেও চলে। পুনঃ পুনঃ সংস্কারে কালে কালে আকারে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু এখনও এই প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ন্যূনাধিক দু'হাজার বৎসরের স্মৃতি বহন করিয়া দর্শকের মন কোন্ সুদূর অতীত যুগে টানিয়া লইয়া যায়। মন্দির পার্শ্বেই 'বোধি-দ্রুম' নামক বিখ্যাত পিপ্পল বৃক্ষ। ইহার মাহাত্ম্যও কম নহে, সমগ্র বৌদ্ধ জগতের লোক এই তরুটিকে অতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে, কেন না, ইহারই নীচে বসিয়াই বুদ্ধদেব সিদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রাচীন তরুটির স্থলে এখন উহার একটি শাখা তরু মাত্র বিরাজ করিতেছে। শোনা যায় সিংহলের অনুরাধাপুরে যে বিখ্যাত বোধিতরুটি দেখা যায়, সেটিও এইরূপ, এইখানকার সেই প্রাচীন বোধি-তরুটিরই একটা শাখা। সম্রাট্ অশোকের বৌদ্ধ প্রীতি ও আরও অনেক কীর্ত্তিকলাপের নিদর্শন এই বুদ্ধগয়ায় ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে পাওয়া যায়। বুদ্ধগয়ার বুদ্ধমন্দিরে পূর্ব্বে একটি কষ্টি পাথরের বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল, কিন্তু সে মূর্ত্তি সম্প্রতি অদৃশ্য হইয়া তদস্থলে কোনও ব্রহ্মদেশীয় ভক্তের প্রদত্ত একটি গিল্টিকরা মৃন্ময়মূর্ত্তি স্থান পাইয়াছে। কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, সকলেই এই মূর্ত্তিটি ও পিপ্পল বৃক্ষটিকে পূজাঞ্জলি করে, এবং হিন্দুরা এই তীর্থে পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধাদিও করিয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রধানতঃ বৌদ্ধ তীর্থ হইলেও এই তীর্থের মন্দিরাদি আজকাল একজন হিন্দু মোহান্তের সম্পত্তি। মোহান্তের বাস মন্দিরের নিকটেই।

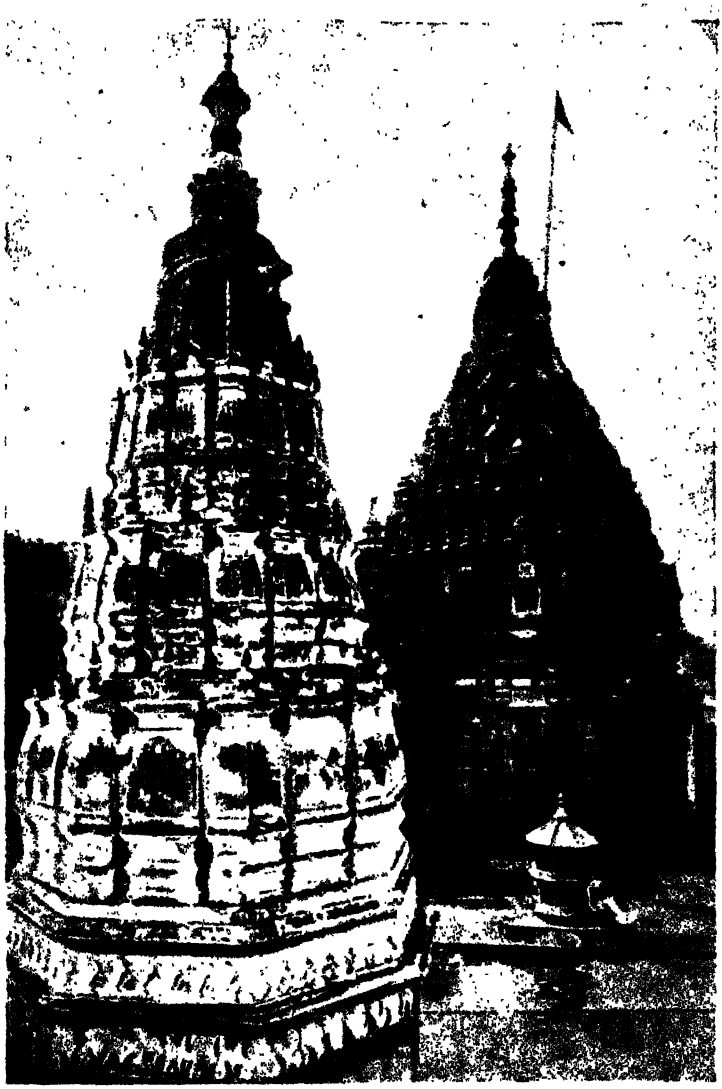

বিষ্ণু মন্দিরের অপর দৃশ্য।

বুদ্ধগয়ার মন্দিরটি যাঁহার অধিকৃত তিনি শঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত। বহু অর্থ ব্যয় এবং বহু পরিশ্রমে আজকাল এই মন্দিরটির সংস্কার হইয়াছে এবং ইহার চতুর্দ্দিক রমনীয় উদ্যান দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া স্থানটি নন্দন কানন তুল্য মনোহর হইয়াছে। এই স্থানের চারিদিকে একটি সৌম্য শান্ত ভাব বিরাজ করিতেছে। এবং এখানে কিছুক্ষণ বিচরণ করিলে চিত্ত তন্ময় হইয়া যায়।

No. 2542—5,000—6-11-29.